KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No KLMLGK 2007	Place of Publication : অনুরাগ প্রকাশালয় ৩৪/2 মাহুর হাসদার স্ট্রীট, কল 2৫
Collection KLMLGK	Publisher শিবজ বন্দ্যোপাধ্যায়
Title অনুরাগ (ANURAAG)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 3 4 5 6	Year of Publication : আশ্বিন ১৪০১ ফাল্গুন ১৩৯৫ বৈশাখ ১৩৯৫ শ্রাবণ ১৩৯৪
	Condition : Brittle Good ✓
Editor শিবজ বন্দ্যোপাধ্যায়	Remarks

CD Rod No KLMLGK

অনুরাগ

পঞ্চম সংকলন : বৈশাখ ১৪০২

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতি ঃ উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক
পৃষ্ঠপোষক ঃ শান্তি রায়, দীপালী চৌধুরী, কমলাপাণি রায়চৌধুরী
অপরেশ সেন

অনুরাগ

পঞ্চম সংকলন ঃ বৈশাখ ১৪০২ বঙ্গাব্দ
মে ১৯৯৫

উপদেষ্টা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য
সহযোগী ঃ জয়ন্তী সান্যাল, নিউটি মজুমদার, মীনা বসু, অর্চিতা রায়চৌধুরী
সাংগঠনিক-প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

দ্বিতীয় বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা / বৈশাখ ১৪০২

সূচীপত্র

সত্য প্রেস, ১০/২এ, প্যারীমোহন সুর লেন, কলি-৬ থেকে মুদ্রিত।
পাঁচ টাকা।

সাহিত্য মেলা

আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী প্রীতিমাধব গুপ্ত গত সংখ্যায় 'অনুরাগ' পত্রে 'হালের বাঙালী সংস্কৃতি' নামে একটি নিবন্ধে লিখেছেন,—'বাংলাভাষা নিয়ে 'অনুরাগ' রীতিমত সুচিন্তিত। আপনি অনুরাগ পরিচালক গোষ্ঠীকে আশঙ্কিত হতে বারণ করছেন। কারণ আপনি মনে করেন এমন একটা সাহিত্য মেলা পৃথিবীর আর কোন ভাষায় হয় না। আর কোন ভাষায় নেই।'

বাংলা ভাষার পুজা সংখ্যা নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করছেন। ...এ কথা সত্যি যে বাংলা ভাষার পুজো সংখ্যা এবং কলকাতার 'বইমেলা' নিয়ে বাঙালী যদি গর্ব করে তবে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। তবু বলব, বাংলা ভাষা আজ নানা দিক থেকে কোণ-ঠাসা হয়ে পড়েছে। সেদিকে আমাদের অবশ্যই নজর রাখা দরকার।

আমরা দেশের সরকার ও জনগণের কাছে আশা করব যে তাঁরা ভারতীয় সব কটি ভাষাকেই সমান মর্যাদা দান করবেন। কাউকে কোলে কাউকে পিঠে স্থান দেবেন না।

গত পঁচিশ বছর যাবৎ বাংলা ভাষা নানা দিক থেকে দাক্ষিণ্য লাভে বঞ্চিত হচ্ছে, অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে, অকারণ তাকে পেছনে ঠেলে ফেলার চেষ্টা চলছে। আমাদের মাতৃভাষার এহেন দরবস্থা আমরা সহ্য করতে পারি না।

সকলেই স্বাধীনভাবে সব ভাষা শিখুক, ব্যবহার করুক, তা আমরা চাই। 'অনুরাগে'র একমাত্র দাবী বাংলা ভাষার যেন অনাদর না হয়। 'অনুরাগ' বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রহরী। সে তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে চায়।

মনের কথা বিশ্বনাথ ঘোষ

সত্যজিৎ রায় গত হবার পর বাঙালি পেয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্ব-সুন্দরী সুস্মিতা সেন, জনতা-অভিনন্দিতা মমতা ব্যানার্জী, বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, প্রধান সেনাপতি শঙ্কর রায় চৌধুরী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে দমদম বিমানবন্দর। একাশি বছরের জ্যোতি বাবু একশো বছরের মোরারজি ভাইয়ের শুভেচ্ছা বিনিময়। তার থেকে আশা করা যায় পশ্চিমবঙ্গেরও একশো রানের সম্ভাবনা। কিন্তু এই বিশ্বজোড়া সুখ্যাতিগুলোর মধ্য থেকে বাঙালীর ভাষা-গৌরব তলিয়ে যাচ্ছে কেন?

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—বেহালা শাখা ১২.২.৯৫ তারিখে বঙ্গভাষা চর্চার জন্য কয়েকজন গুণী মানুষকে পুরস্কার ও উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। উপহার দিয়েছেন নগদ অর্থ, উত্তরীয়, ফুলের স্তবক, রৌপ্যপাত্র, মানপত্র ইত্যাদি। বৈষ্ণবসাহিত্যিক প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীকেও এই সম্মানে সম্মানিত করেছেন তাঁরা। শ্রীযুক্ত প্রণয়কৃষ্ণ আমাদের 'অনুরাগ' গোষ্ঠীর আপন জন। তাই অনুরাগেরও আজ জয়জয়কার আমরা অনুভব করছি।

নির্দেশিকা

অনুরাগে 'ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা' পড়লাম। যে সব তথ্য দিয়েছেন তা সব প্রামাণ্য কিনা মনে প্রশ্ন জাগে। তাই কোথা থেকে ওইসব তথ্য পেলেন ঠিকানা নির্দেশ দিয়ে জানালে ভাল হত। ভাষা সাবলীল ও ঝরঝরে। পড়তে ভাল লাগে। 'অনুরাগ' পাওয়ার জন্য সম্পাদিকাকে ধন্যবাদ। আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

শিশির কর
শ্রীবাস দত্ত লেন, হাওড়া-১

স্মৃতিতীর্থ—সেলুলার জেল দীপালী চৌধুরী

[ভারতের একটি পবিত্র পীঠস্থান আন্দামানের সেলুলার জেল। তার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীমতী দীপালী চৌধুরী ১৯৮২ সালে। আন্দামান বন্দী মুক্তির দাবীতে প্রথম কলকাতায় বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ টাউন হলের দোতলায়। বোধহয় লিফটের অভাবে তাঁর নাতি সৌম্যেন্দ্রনাথ কোলে করে উপরে তোলেন কবিকে। —সম্পাদক]

আমাদের আন্দামান ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে আমরা পরিদর্শন করেছিলাম ভারতবর্ষের পরম পবিত্র, মুক্তি তীর্থ "সেলুলার জেল"। সেলুলার জেল সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আন্দামানের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-চার কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেই যায়। আন্দামানের সদর শহর হল পোর্ট ব্লেয়ার। এই শহরেই ঐতিহাসিক সেলুলার জেলটি অবস্থিত। এইটি আন্দামানের দক্ষিণাঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরের কূলে। সুনীল সফেন সাগরের কোলে। সবুজ পাহাড়ের মাথায় গাঢ় সবুজ গাছ-পালার ফাঁকে ধাপে ধাপে লাল, সবুজ, খয়েরী রঙের সুদৃশ্য সব বাংলো ধরণের বাড়ীগুলি সমেত পোর্ট ব্লেয়ার শহরকে মনে হয় যেন রূপকথার একটি রাজ্য। এতো সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই কুখ্যাত সেলুলার জেলটি সৃষ্টি করেছিল ভারতের বীর মুক্তি-যোদ্ধাদের এখানে নির্বাসিত করার জন্যে। অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের চোখে দেশপ্রেমই হল মুক্তি যোদ্ধাদের প্রধান দোষ।

বৃটিশ আমলে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের নেতৃত্বে বর্তমান পোর্টব্লেয়ারের কাছে ছাডাম দ্বীপে একটি উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। উদ্দেশ্যই ছিল প্রথম থেকে এই

পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় একটি কয়েদী নিবাস গড়ে তোলার। এরপর প্রায় এক শতাব্দি পরে অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার নতুন করে উপনিবেশ গড়ে তোলা হল আন্দামানে; সিপাহী বিদ্রোহের পরে। এই উপনিবেশের প্রথম নেতা ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের নামানুসারে "পোর্টব্লেয়ার" শহর নামকরণ করা হল। ব্রিটিশরা এখানে আসার বহু আগে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে চলে যেত। কেউই কিন্তু দুরন্ত হিংস্র আদিবাসী—জারোয়া, অঙ্গ সেণ্টিনেলিজ অধ্যুষিত গভীর জঙ্গলে ঘেরা এই দ্বীপপুঞ্জে পদার্পণ করতে সাহস করত না। ব্রিটিশরাই প্রথম এই আন্দামান অঞ্চলটিকে নিজেদের সুবিধার্থে বাসোপযোগী করে তোলে কয়েদী নিবাসে পরিণত করে। ভারত এবং বার্মার দলে দলে কয়েদীদের এখানে পাঠাতে আরম্ভ করল। আন্দামানে তখনও কয়েদীদের আটক রাখার জন্য তেমন কোন সুগঠিত জেলখানা ছিল না।

দিনেরবেলা পাহারাদারদের অধীনে বন্দীরা খোলা জায়গায় ক্রীতদাসের মত সারাদিন কাজ করত। রাত্রিবেলায় একটি ঘেরা জায়গায় পশুর মত তাদের গোয়ালের মত ঘরে বন্দী করে রাখা হত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী এটাকে নিরাপদ ব্যবস্থা বলে মনে করত না। তাই তারা ঠিক করল এখন অভিনব একটি জেলখানা তৈরী করবে কায়েদীরা যাতে কেউ কারো সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করতে না পারে। ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশ পরিকল্পিত সেই ভয়ংকর সেলুলার জেলের নির্ম্মান কার্য্য শুরু হল। সুন্দর বার্মা থেকে জাহাজে করে নিয়ে আসা হল দফায়, দফায় ইট, বালী, চুন সুরকী নারকীয় এই যজ্ঞের কাজ সম্পন্ন করার জন্য, ধীরে ধীরে তৈরী হয়ে ১৯১০ সালে সম্পূর্ণ হল ৭০০ কুঠুরীর (cell) ভয়াবহ এই সেলুলার জেল। এই জেলটি প্রথম তৈরী হয়েছিল শুধু সমাজ বিরোধী কয়েদীদের জন্য। ক্রমশ জেলটি ব্যবহৃত হতে লাগলো ভারতের নির্দোষ, দেশপ্রেমী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কারাগার হিসেবে। ১৮৫৮ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের হাজার, হাজার মুক্তিকামী রাজনৈতিক বন্দীদের সেলুলার জেলে আজীবন নির্বাসন দণ্ড দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত আন্দামানে প্রেরিত রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বৃটিশ সরকার অসহনীয় অপমান ও অত্যাচার চালিয়েছিল তার কোন তুলনা নেই। অনেক উজ্জ্বল মুক্তি সংগ্রামী এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছিলেন এই আন্দামানে। অনেক মুক্তি সংগ্রামীকে আবার হত্যাও করা হয়েছিল।

এবার আমাদের সেলুলার জেল দেখার অভিজ্ঞতা একটু বলি। আমরা (২৪-১২-৮২) দুপুরবেলা পোর্টব্লেয়ার শহরের হ্যাডো অঞ্চল থেকে একটি বাসে চেপে মিনিট দশেকের মধ্যে পবিত্র তীর্থ সেলুলার জেলের সবুজ প্রাঙ্গনে এসে চুপ করে দাঁড়ালাম। জেলের প্রবেশ দ্বারে লোহার ফলকে লেখা আছে "Sellulor jail Port Blair" আমাদের সাথে রয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি দল যারা একদা এই কুখ্যাত জেলের অধিবাসী ছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর এরা ছাড়া পান। এরা এসেছেন এখানে মৈত্রী চক্র সংগঠনের তরফ থেকে সেলুলার জেলের ৭৫ বছর পূর্ত্তি উৎসব পালন করতে। তাঁদের সবার বয়েস এখন ৬৫।৭৫ এর কম নয়। কিন্তু প্রাণোচ্ছল উৎসাহে যে কোন যুবাদের এরা হার মানাবেন। এদের মধ্যে যার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ। তিনি একটি সভাতে দুঃখ করে বলে ছিলেন, আমাদের ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পিছনে ছিল বিরাট এক অনুপ্রেরণা, এবং স্বপ্ন। মুক্ত ভারতে আমরা শোষণ মুক্ত, সাম্যবাদী একটি সমাজ তৈরী করব। স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন দিকে অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু উন্নতির ফল গরীব জনসাধারণের কাছে কতটুকু পৌঁছেছে? এই স্বাধীনতা ঝুট হ্যায়। অতি সত্য কথা এটি।

এদের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে আমাদের আন্দামান ভ্রমণ অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল। এই দলের যিনি নেতা বঙ্গেশ্বরদা বলতে লাগালেন—জানো, এই সেলুলার জেলকে "বাস্তিল অব ইণ্ডিয়া" বলা হয়। প্যারিসের পূর্বাংশে একটি চতুষ্কোণ ভূমিতে আটটি স্তম্ভের ওপর একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন পঞ্চম চার্লস। নাম দিয়েছিলেন বাস্তিল দুর্গ। পরে এটিকে জেলে পরিণত করা হয়েছিল। এই জেলে সব নামজাদা মানুষদের রাখা হয়েছিল। ভালটেয়ারও নির্বাসিত হয়েছিলেন এই জেলে। ফরাসী রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ১৭৮৯ খৃীঃ এই দুর্গটি ধ্বংস করে এবং এখান থেকেই ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমানে অত্যাচারী বৃটিশ শাসনের অবসানের পর এই সেলুলার জেলও আমাদের অমর, নির্ভীক স্বদেশ প্রেমীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি জাতীয় স্মৃতি সৌধের মর্যাদা লাভ করেছে। এখন প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে পরম মুক্তি তীর্থ এই সেলুলার জেল। এই জেলটি পোর্টব্লেয়ার শহরের পূর্ব্ব কোনে একেবারে সমুদ্রের ধারে একটি অনুচ্চ সবুজ টিলার ওপর নিঃশব্দে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মুক্তিযোদ্ধা, দেশ-প্রেমীদের নির্যাতনের স্মৃতি বুকে নিয়ে। জেলটির প্রতিটি ইট, কাঠ যেন অতীতের ভারাক্রান্ত ইতিহাস বলার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। এই ইতিহাসের কাহিনী হল ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের অসীম আত্মত্যাগ, আর অদম্য সাহসিকতার কাহিনী। অন্য দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের নিষ্ঠুরও নারকীয় নির্যাতনের ইতিহাসও বটে। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। জেলখানার প্রবেশ পথে দুদিকে দুটো হল ঘরে আগে অফিস ছিল। এখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও নানান স্মৃতি সামগ্রী নিয়ে দুটো হলে মিউজিয়াম করা হয়েছে। ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের নির্যাতিত জীবনের অত্যন্ত জীবন্ত এক জীবন আলেখ্য এই মিউজিয়ামটি। আমাদের সহযাত্রী

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজ্যভিত্তিক ও কালানুক্রমিক ছবি দেয়ালে টানানো আছে। তাদের নিজেদের মুখ থেকেই শুনলাম তাদের কিভাবে চোখ ও হাত বেঁধে নিয়ে এসে অন্ধকার কুঠুরিগুলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারা চটের পোশাক পরে চটের বিছানায় শুতো দিনের পর দিন। নোংরা পাত্রে অখাদ্য কুখাদ্য খেতে দিত রোজ। তাদের পাশেই যে এতো সুন্দর নীল সমুদ্র নারকোল কুঞ্জে ঘেরা তারা তখন জানতেও পারে নি। এখন ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কত পরিবর্ত্তন। রাজনৈতিক বন্দীরা ছাড়া পেয়ে সেলুলার জেলে নিজেদের ছবি নিজেরাই ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্মৃতিচারণ করছেন মুক্তমনে সেই সব অতীতের অসহনীয় দিনগুলির কথা।

জেলের পাশে নীল সমুদ্রের ধারে সবুজ নারকেল কুঞ্জে সমুদ্রের দমকা হাওয়া যেন তখনকার বৃটিশ শাসকদের অকথ্য অত্যাচারে অত্যাচারিত ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ। কেন জানি না মন আমাদের সেই মুহূর্ত্তে বিষাদে ভরে উঠল ভারতের মুক্তি যোদ্ধাদের মরণ-পণ সংগ্রামের কথা স্মরণ করে।

আমরা নীচের তলার মিউজিয়ামটি দেখে একটি টিনের সেডের পাশ দিয়ে খোদ সেলুলার জেলের ভিতরে এসে উপস্থিত হলাম। জেলটিতে ৭০০টি কুঠুরী অর্থাৎ সেল ছিল আগেই উল্লেখ করেছি। জেলেটির গঠনশৈলীও অসাধারণ। সুন্দর একটি রথের চাকার মত। একটি গম্বুজাকৃতি বিশাল উঁচু টাওয়ার থেকে সাতটা ওয়ার্ড সাতদিকে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত সূর্য্যের সাত রঙের মত। এখন অবশ্য জেলটির বেশীর ভাগ অংশই ভেঙে ফেলা হয়েছে বিদায়ী বৃটিশ সরকারও ভারতের বিশ্বাসঘাতক কিছু রাজনৈতিক নেতাদের কুচক্রান্তের যোগসাজে। তবে বেশ কয়েকজন জেল ফেরত মুক্তিসংগ্রামী "মৈত্রীচক্র" নামে একটি সংগঠন তৈরী করে বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

আবেদন করে জেলটির শুধু এক নম্বর ও সাত নম্বর ওয়ার্ডটি রক্ষা করতে পেরেছেন। আর কিছুদিন দেরী হলে সেলুলার জেলের চিহ্নও আজ আর থাকতো না। এক নম্বর ওয়ার্ডটি এখন এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট জেল। সাত নম্বর ওয়ার্ডটি খালি পড়ে আছে, অন্য ওয়ার্ডগুলি ভেঙে এখন একটি হসপিট্যাল তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় টাওয়ার থেকে সাতটা ওয়ার্ডে যাওয়ার জন্য আসার জন্য সাতটা আলাদা লৌহ কপাট ছিল। প্রতিটি ওয়ার্ডই তিনতলা। কোন ওয়ার্ডে ২০টি, কোনটি ২৫টি কোনটিতে ৪২ কোনটিতে ৫২ সেল ছিল। প্রত্যেকটি সেল ১০ ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট চওড়া প্রত্যেক সেলের ৮ ফুট উঁচুতে পেছনের দেয়ালে পাল্লাবিহীন গোল ফোকর আছে। জানালা বলতে কিছু নেই। বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশ যে এতো সুন্দর এখানকার বাসিন্দারা বুঝতেও পারতেন না। এই জেলের নোংরা পরিবেশে অনেক রাজনৈতিক বন্দী, অকালে মারাও গেছেন। কেন্দ্রীয় বিশাল গম্বুজটির উচ্চতা প্রায় দু তলার সমান।

একেবারে উপরে ছিল পর্য্যবেক্ষণ কক্ষ। এই কক্ষ থেকে বন্দুকধারী প্রহরীরা চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ দৃষ্টি রাখতো সেলুলার জেলের চতুর্দিকে। এখন অবশ্য এইসব কিছুই আর নেই। শুধু সেণ্ট্রেল পাওয়ারটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে অতীতের বিষণ্ণ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে। আমরা সেণ্ট্রেল টাওয়ার থেকে তিন তলায় সাত নম্বর ওয়ার্ডের টানা লম্বা বারান্দার বাদিকে সারি সারি সেলগুলির সামনে এসে দাঁড়ালাম। সব সেলগুলি এখন খালি। টানা বিশাল লম্বা বারান্দা ধরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেলগুলি দেখতে দেখতে চলেছি। একেবারে শেষ প্রান্তের সেলটির সামনে আসতেই দেখতে পাচ্ছি দেয়ালে একটি ছবি টাঙানো আছে। ছবিটির নীচে ধূপাধারে জ্বলন্ত ধূপের সন্ধানও মিলল। এই ছবিটি মুক্তি যোদ্ধা, বীর ও দেশপ্রেমিক পরম শ্রদ্ধেয় বিনায়ক দামোদর সাভারকারের। তাঁকে বৃটিশ পুলিশ

বহু চেষ্টার পর ধরতে সক্ষম হয়েছিলে ১৯১০ সালে ১৩ই মার্চ। ১৯১০ সালের ২৪শে ডিসেম্বরে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ১৯১১ সালের প্রথম দিকে আন্দামানে সেলুলার জেলে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই বীর দেশপ্রেমিকের দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতার উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সবার মন-প্রাণ গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হল এই ঐতিহাসিক সেলটির সামনে। বীর সাভারকারের সেলের সামনের বারান্দার ঠিক নীচে মাঠের মাঝে একটি বড় পাকা ঘর দেখা যাচ্ছে। এই ঘরটিতে তখন কয়েদীদের ফাঁসি দেওয়া হত। ফাঁসিকাষ্ঠটি তখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অনেকের অমূল্য প্রাণ এই ফাঁসি-কাষ্ঠে আহুতি দেওয়া হয়েছিল। আমরা দম বন্ধ করে একের পর এক সব দেখে যাচ্ছি—আর ভাবছি ব্রিটিশ শাসকের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। আমরা বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আরও একতলা ওপরে উঠে এসে দেখতে পেলাম সামনে দেয়ালে শ্বেত পাথরের বড় বড় স্ল্যারের উপর সেলুলার জেলের প্রাক্তন কর্মীদের কালানুক্রমিক রাজ্য ভিত্তিক সব নাম খোদাই করা আছে। আর এক ধাপ ওপরে উঠতেই খোলা বিশাল বড় মাঠের মত সেলুলার জেলের ছাদে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খোলা ছাদ থেকে দেখা যাচ্ছে—নারকেল কুঞ্জে ওপরে দিগন্ত বিস্তৃত নীল উদার বঙ্গোপসাগরকে। সাগরের নীল সফেন ঢেউ-এর মাথায়, মাথায় গাঢ় সবুজ দ্বীপমালা যেন স্বর্গের অপ্সরীরা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। সাগরের হাওয়ার দোলায় নারকেল কুঞ্জের পাতায়, পাতায় কি যেন এক বিষন্ন, করুণ সন্ধ্যা সুর বেজে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ ছাদে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। সূর্য্যাস্তের আর বেশি দেরী নেই। আমরা সমুদ্রের ধারে নেমে এসে এবার্ডিন জেটির একটি কাঠের টুলে বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপচাপ বসলাম। সুনীল আকাশে আর সফারের নীল জলের

আবীর রঙ ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব আজকের মত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমাদের ঠিক পিছনে ম্যারিনা পার্কে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভারতবর্ষের আর এক বীর মুক্তিযোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্ত্তি, দৃপ্ত ভঙ্গিতে অকূল সাগরের পারে তাকিয়ে আছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাপানীদের সহযোগিতায় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা তুলেছিলেন এইখানে, এই পুণ্যভূমি আন্দামানে পোর্টব্লেয়ার ১৯৪৩ সালে ২৯শে ডিসেম্বরে এবং আন্দামানের নাম শহীদ ও নিকোবরের নাম স্বরাজ দিয়েছিলেন।

গোধূলির ম্লান রক্তিম আলোতে সামনেই বঙ্গোপসাগরের কোলে সবুজ গাছপালায় ঢাকা রহস্যময় "রস" আইল্যাণ্ড যেন ঘোমটা টেনে বসে আছে। সাগরের উত্তাল ঢেউগুলি দুষ্টু ছেলের মত "রস" সুন্দরীর ঘোমটা খুলে মুখ দেখে আবার হেসে পিছু হটে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্য আমাদের মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দিল। আমরা যেন এতোক্ষণ সেলুলার জেলের দমবন্ধ বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবে ছিলাম। ক্রমশ আমাদের সম্বিত ফিরে এলো। —আমরা সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ালাম।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ঃ—

(১) পোর্টব্লেয়ার শহরে আমরা শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজে অথবা Indian Air Lines-এর প্লেনে যেতে পারি।

(২) সেখানে থাকবার জায়গা ঃ সরকারী গেষ্ট হাউস, ইউথ হোষ্টেলে এবং কয়েকটি হোটেল আছে।

(৩) অনেক দ্রষ্টব্য আছে পোর্টব্লেয়ার শহরে ও আশেপাশে ছোট, ছোট জাহাজে করে বিভিন্ন দ্বীপেও যাওয়া যায়। এই ব্যাপারে সেখানকার ম্যারিন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

চিঠিতে চিঠিতে অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার স্ত্রী ঘরে উপস্থিত না থাকলে আমি আলমারি হাঁটকাতে ভালবাসি। এটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সব সময় যে বহুমূল্য ধনরত্ন পাই তা নয়। তবে কথায় আছে না, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। সেই কথাটি আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি আর কি।

সেদিন আলমারি ঘাঁটতে গিয়ে পেয়ে গেলাম একতাড়া ব্যক্তিগত চিঠি। একটা জরির সুতো দিয়ে বাঁধা। মুখে মুচকি হাসি নিয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে বিজয়গর্ব্বে বললাম—পেয়ে গেছি—জানো—পেয়ে গেছি। স্ত্রী আমার এ অভ্যাসটার সঙ্গে পরিচিতি ছিলেন। তিনি আমার আবিষ্কারে গুরুত্ব না দিয়ে মুখ ভেংচে বললেন—কি আবার মাথামুণ্ডু পেলে? আমি বললাম—তোমার মারণাস্ত্র। তোমার প্রাক-বিবাহ পর্বের প্রেমের ফসল—একগুচ্ছ প্রেমপত্র। গিন্নী মাথায় হাত চাপড়ে বললেন—'আ! আমার মরণ! মাথাটার গণ্ডগোল হয়েছে, এ আমি আগেই সন্দেহ করেছি। কিন্তু চোখের মাথাটা যে খেয়ে বসে আছ, তা বুঝতে পারিনি।' আমি দমে গিয়ে বললাম—'কেন? কেন? ভুলটা কোথায় হল? তিনি বললেন—'আমি কি এতই নিরেট যে তোমার মত সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত লোকের হাতে তা তুলে দেবার জন্য আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছি? চোখ খুলে দেখ, চিঠিগুলোর লেখক কে?' দেখলাম—চিঠিগুলোর লেখক সুবল চন্দ্র দাশ এবং লেখিকা সুজাতা মুখোপাধ্যায়। বোকা বনে গিয়ে বললাম—'তাহলে এগুলো আমাদের এখানে এল কেন? লেখক-লেখিকার পরিচয়ই বা কি? তিনি বললেন—সুজাতা আমার

বি. এ. ক্লাসের বন্ধু। ওদের বিয়ের আগে, অসুবিধার কথা চিন্তা করে, চিঠিগুলো আমার কাছে রাখতে দিয়েছিল। আর নেয় নি। চিটিগুলোর তলায় একটা নিমন্ত্রণ-পত্রও ছিল। চোখে পড়ে নি? নিমন্ত্রণ-পত্রটা পেলাম। মনে হল এর মধ্যে একটা গল্পের গন্ধ রয়েছে। সবকটা চিঠি পরপর পড়ে ফেললাম। বেশ মজা লাগল। সেই মজার আনন্দ আপনাদের দেব বলে সবকটা চিঠি পরপর সাজিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

এক

প্রিয় মক্ষীরাণী,

আমি জানি তোমার আসল নাম সুজাতা। তবু কেন তোমায় মক্ষীরাণী বলে সম্বোধন করলাম জান? তুমি যে ভাবে তোমার পুরুষ সহপাঠীদের মধ্যে দর্পিত ভাবে ঘুরে বেড়াও তা দেখে আমার মক্ষীরাণীর কথা মনে পড়ে গেল। তুমি প্রায় সকলের সঙ্গেই অনুগ্রহভরে কথা বল, অথচ আমার সঙ্গে কথা বল না কেন? আমার দিকে ফিরেও তাকাও না কেন? আমায় চিনতে পারছ ত? আমি তোমার ঠিক দুটো বেঞ্চ পেছনে বাঁ দিকের কোনটায় বসি। ইতি তোমার

অকৃত্রিম ভক্ত ও অনুগ্রহ-প্রার্থী
সুবলচন্দ্র দাশ

দুই

প্রিয় সুবলবাবু

আপনার চিঠিতে নাম-ঠিকানা রয়েছে বলে এখনই পুলিশের হাতে তুলে দিলাম না। দ্বিতীয়বার এরকম বাঁদরামি করলে কিন্তু পুলিশের লকআপে ঢুকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আপনার চিঠিটা সকলের চোখে পড়েছে। সকলে খুব হাসাহাসি

করেছে। আমার বড়মামা একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। তিনি সব দেখেশুনে বললেন, সুজাতা, মনে হচ্ছে ছেলেটা নিরীহ, গো-বেচারা-ভালমানুষ। ইমম্যাচুওরড। কাফ্ লাভের ধাপ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একেবারে গুরুত্ব দিস না। পুলিশ এমনিতেই অন্যান্য নানা ব্যাপারে বিব্রত আছে। তাই নিরস্ত হলাম। আপনাকে চিনতে পেরেছি। একটা মোটাসোটা গোলগম্বুজ গোঁয়োভূত পেছনে বসে কি সব লেখে বটে! তবে তার নাম যে সুবল তা জানতাম না। তবে ওরকম গরুচোরের মত মুখ নিচু করে বসে থাকেন কেন? জানবেন, আমি কারুর সঙ্গে যেচে কথা বলতে যাই না। সহপাঠীদের মধ্যে যারা কথা বলে শুধু সৌজন্যবশতই তাদেরই কথার উত্তর দিই। লিখেছেন, আপনি আমার ভক্ত। আমায় যে চাকরটা রোজ আমার জুতো পালিশ করে দেয় সেও একদিন আমায় জানিয়েছিল যে সে নাকি আমার ভক্ত। আমি ত হেসে মরি আর কি? লিখেছেন, আপনি আমার অনুগ্রহপ্রার্থী। আপনার মত একজন গন্ধ গোকুলকে আমি কি অনুগ্রহ করতে পারি, বুঝতে পারছি না। আমার বাবা একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমাদের বাড়ির মাসিক খরচ পনের হাজার টাকা। আমার পেছনেই লাগে মাসিক দু হাজার টাকা। কি আঁৎকে উঠলেন নাকি? বঙ্কিমচন্দ্র ও টিকিট কালেক্টরের গল্পটা আর একবার শুনিয়ে দিচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিলেন। একবার সালঙ্কারা সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে তিনি নৈহাটি ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন ট্রেন ধরবেন বলে। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, এক টিকিট কালেক্টর বার বার অপাঙ্গোতার স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝে একটু মজা করতে চাইলেন। টিকিট কালেক্টরকে কাছে ডেকে বললেন—'কত মাইনে পাওয়া হয়? টিকিট কালেক্টর কাছে আসতে পেয়ে বিনয়ে বিচলিত হয়ে হাত কচলে তার মাইনের কথা জানাল।

ঢেলেও মন পাচ্ছি না। ছেড়ে দেব ভাবছি। এ হাতি পোষা বঙ্কিমচন্দ্র কপট গাম্ভীর্যে 'এ-হে; বড়ই কম! সামলাতে পারবেন? আমি ত মশাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটির সব টাকা সম্ভব নয়! আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।' টিকিট কালেক্টর চোখমুখ লাল করে লজ্জায় পালিয়ে বাঁচল। আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা, আমার অনুগ্রহ পেতে হলে হাতি পোষার খরচ জোগাতে হবে। ক্ষমতায় কুলোবে ত?

ভবদীয়া সুজাতা মুখোপাধ্যায়।

তিন

প্রিয় মক্ষীরাণী,

জানতাম, মৌচাকে ঢিল মারলে দংশনের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তা যে এত মারাত্মক হবে তা জানতাম না। চিঠি লেখার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি। আসলে কি জানেন, দংশনের জ্বালা সহ্য করা যায়, কিন্তু অসম্মানের জ্বালা চোখে জল এনে দেয়। আপনার চিঠি আমাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনলো। মনে পড়ে গেল, বাবা রেলের চাকরী থেকে এ মাসেই রিটায়ার করছেন। গ্রামের বাড়ির ছাদটা এখনই সংস্কার করা দরকার। বিরাট দায়িত্ব আমার উপর। আপনার জুতো পালিশ করা চাকরের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি হতে চাই না। আমার আদর্শ কবি জয়দেব। আমার বক্তব্য ছিল, দেহি পদ পল্লব মুদারম।

নমস্কার জানাবেন ইতি

বিনীত সুবল দাশ

চার

প্রিয় সুবলবাবু—

আপনার এবারের চিঠিটায় আপত্তিকর কোন কিছু খুঁজে পাইনি বলে এটারও উত্তর দিচ্ছি। তবে বারে বারে এমন করলে

অমার্জনীয় অপরাধ বলে ধরব। আপনাকে একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি। দেখুন ভাল লাগে কি না। গ্রামের বাড়ি গিয়ে চাষবাসে মন দিল। অথবা রেল বা অন্য কোন সরকারী অফিসে কেরানীর চাকরি জোগাড় করে নিন। আপনাকে মানাবে ভাল। আপনার চালচলনের সঙ্গেও মানান সই হবে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি আমি ন্যাকাবোকা ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী নই, তাই কবি জয়দেবের প্রতি আমার ভক্তি বা ভালবাসা কিছুই নেই। 'বাংলার বধূ, বুকে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা' ধরণের একটা মেয়েকে নির্ব্বাচন করুন। তার কাছে গিয়ে বারবার প্রার্থনা জানান, দেহি পদপল্লব মুদারম। খুব লাগসই হবে। আমি এবং আমার হবু স্বামী যিনি যুক্তরাষ্ট্রে এম. বি. এ. করতে গেছেন, আমরা—ফাস্ট লাইফে বিশ্বাসী। বিয়ের পরে আমাকেও হয়ত ওখানে গিয়ে থাকতে হতে পারে।

অলম ইতি বিস্তরেন ভবদীয়া সুজাতা মুখোপাধ্যায়

পাঁচ

প্রিয় সুজাতা—

তোমার চরিত্রের মত তোমার চিঠিগুলোও বক্র, কঠিন ও তীক্ষ্ণ, নিষ্পাপ ভক্তিও ভালবাসাকে যা এককোপে আহত ও পযুদস্ত করতে পারে। তবে তোমার একটা পরামর্শ বোধ হয় আমার জীবনে কার্য্যকর হয়ে উঠবে। বাবার রোজগার বন্ধ হবার পর আমাকেই সংসারের অন্ন জোগাবার ভার নিতে এগিয়ে আসতে হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে একটা কাগজের কলে কনিষ্ঠ কেরানীর কাজ পেয়েছি। আগামী সপ্তাহেই চলে যেতে হচ্ছে। যাবার আগে সম্ভবত এটাই শেষ যোগাযোগ। ফরগেট এণ্ড ফরগিভ। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমার বই এবং নোট্‌স্‌গুলো তোমার হাতে তুলে দিয়ে যেতে চাই। গ্রহণ করে বাধিত কোরো। ইতি

সুবলচন্দ্র দাশ

ছয়

প্রিয় সুবলবাবু—

আপনার চিঠি পেলাম। পড়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নি। তবে যদি আমার ভয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দেন, সেক্ষেত্রে আমার দুঃখপ্রকাশ করা ভিন্ন কিছু করার নেই। যদি অন্য কোন ব্যক্তিগত কারণে হয়, তবে বলব—ভালই করেছেন। শহর থেকে দূরে পালিয়ে যান। শান্তি পাবেন। কেননা, এখানে আপনি মিসফিট।

আপনার বইগুলো কলেজ ষ্ট্রীটের পুরাণো বইয়ের দোকানে বিক্রী করে দিন। রাহা খরচ উঠে আসবে। আমার নিজের এত বই আছে যার সংখ্যা আমারও খেয়াল থাকে না। অভাব শুধু সময় করে পড়ার। নোট্‌স্‌গুলো নিতে পারি, বিনাসর্ত্তে। দারোয়ান পাঠিয়ে দেব। দিয়ে দেবেন। ভবিষ্যতে আর যোগাযোগ না থাকলে উ ভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে বলে মনে করি।

নমস্কারান্তে— সুজাতা মুখোপাধ্যায়

সাত

প্রিয় মক্ষীরাণী

ভেবেছিলাম, আর বিরক্ত করব না। কিন্তু ভূপালের কাগজ কলে জয়েন করার পর থেকে আমি বাস্তবিকই নির্ব্বান্ধব হয়ে গেছি। নির্জ্জনতা আমায় পেয়ে বসেছে। যতভাবি ভুলে যাব, মন মানে না। আশাকরি, পরীক্ষার জন্য ভাল প্রস্তুতি নিচ্ছো।

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ বিনীত সুবলচন্দ্র দাশ

আট

প্রিয় সুবলবাবু—

ভেবেছিলেন, ভূপালের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখলে আমি

প্রত্যুত্তরে চিঠি লিখব। কিন্তু আপনি জানেন না, আমি দৃঢ়চেতা মহিলা। যা গ্রহণযোগ্য নয়, তা গ্রহণ করতে মন উঠে না। তবু কেন এই চিঠি লিখলাম? শুধু মানুষ হিসেবে সব মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে বসিনি এটা প্রমাণ করতে। অর্থাৎ জানাতে চাই, আপনার পাঠানো নোট্‌স্‌গুলো খুব কাজে লেগেছে। ধন্যবাদ। আর একটা কথা। নির্জ্জনতা কাটাবার একটা পন্থা বলছি। পারেন কিনা দেখবেন। জোব চার্ণকের রাস্তা নিন। একজন আদিবাসী রমণীকে জীবনসঙ্গিনী করুন। মজা জমবে ভাল। সে তার ভাষায় প্রেম নিবেদন করবে, আপনি আপনার ভাষায়। কেউ কারুরটা বুঝবে না। অথচ নির্জনতা কাটবে। কেমন হবে? ভাল বলিনি? ইতি সুজাতা মুখোপাধ্যায়

নয়

প্রিয় সুবলবাবু—

দীর্ঘ ছয় বছর পরে চিঠি লিখছি এবং আপনার শহর এই ভূপাল থেকেই। আমাকে মনে রেখেছেন কি? আপনি একদা যাকে মক্ষীরাণী বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেই সুজাতা মুখোপাধ্যায়—আমি।

ভূপাল থেকে কেন? সে অনেক ব্যাপার! ইতিমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সংক্ষেপে বলছি। আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকের বিয়ের ঠিক ছিল তিনি সেখানে এক শ্বেতাঙ্গিনীর জালে পড়ে আটকে গেছেন। আর যোগাযোগ নেই। ভালভাবে এম. এ. পাশ করার পরে স্কুল-কলেজে একটা শিক্ষিকার চাকরী পেতে পারতাম। কিন্তু নিই নি, সেটা আমার ধাতে সয় না বলে, মা-বাবা উভয়েই আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে গত হয়েছেন। এখন আমি মডেলিং এর কাজ করি। সেই উপলক্ষেই ভূপালে আসা। এখানে এসেই আপনার কথা মনে পড়েছে। তাই এই পত্রাঘাত। রবিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে থাকবো।

রবিবার লাঞ্চে আমার সঙ্গে রুহেভেন হোটেলে দুশো সাত নম্বর রুমে যোগ দিলে আনন্দ পাব। বর্ত্তমানে আমিও কেমন যেন একাকিত্ব বোধ করছি। আপনার স্ত্রীপুত্র কন্যাকেও নিয়ে আসবেন, আপত্তি নেই। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালাম।

বিনীতা সুজাতা মুখোপাধ্যায়

দশ

প্রিয় সুজাতা—

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার জীবনেতিহাস শুনে খুব ব্যথিত হলাম। তোমায় আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। তোমার স্মৃতি আমার মনোমুকুরে এখনও উজ্জ্বল। তোমার ডাকে সাড়া দেব না সে সাধ্য আমার নেই। তুমি আমায় যত ঘৃণা করেছ আমি ততই তোমার গভীরে ডুবে গেছি। এখনও আমি তোমাতে মগ্ন। আমি রবিবার একটু আগেভাগেই যাচ্ছি। তবে একলা। কেননা কোন আদিবাসী রমণীও আমাতে আসক্ত হয়নি। তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতি ও ভালবাসা রইল।

ইতি সুবলচন্দ্র দাশ

এগারো

প্রিয় সুজাতা

তুমি সেদিন আমাকে যেভাবে অপ্যায়ন করলে তাতে আমি অভিভূত ও কৃতার্থ। তবে তোমাকে বড় হতাশ ও নিঃসঙ্গ মনে হল। ঘর বাঁধার কথা ভাবছ না? উপযুক্ত সঙ্গী কি জীবনে আসে নি? যদি কোনদিন কোন অনুপযুক্ত ভক্তকে তোমার জীবনের সঙ্গে বাঁধতে চাও, আমায় জানিও। বর্তমানে আমার আয় ভালই। আমরা উভয়ে চাইলে একটা সুখ ও শান্তির নীড় গড়ে তুলতে পারব বলে বিশ্বাস। প্রীতি ও ভালবাসা জানালাম।

ইতি সুবল।

বারো

প্রিয় সুবল

তোমার চিঠি অন্তর থেকেই লেখা বলে মনে হল। তোমার প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য। তোমার মধ্যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। প্রত্যাঘাত-প্রবণতা নেই। আমার পূর্বেকার সব অপরাধ তুমি নিজগুণে ক্ষমা করে দিও। আমি বুঝেছি, আমার রূপ বহিরঙ্গের, তোমার রূপ অন্তরের। আমি পিতার গচ্ছিত সম্পদে ধনী। তুমি নিঃস্ব হয়েও রাজা। আমি ক্লান্ত ও নিঃশেষিত। এবার তোমার জীবনে জীবন যোগ করে বাঁচতে চাই।

কলকাতায় আমার সঙ্গে এসে দেখা কর। তারপর আমি বধূবেশে ভূপালে যাব। ভালবাসা নিও—

সুজাতা

* * *

* এরপর আর চিঠি নেই। রয়েছে চিঠিগুলোর সঙ্গে একটি নিমন্ত্রণপত্র। পাত্রের নাম সুবলচন্দ্র দাশ ও কন্যার নাম সুজাতা মুখোপাধ্যায়। ওরা দুজনে দুজনকে তিন নম্বর চোখ দিয়েই দেখেছিল। তাই ওদের বিয়েটা শান্তির বিয়ে হয়েছে। আমার তিন নম্বর চোখটা একেবারেই নেই।

*

কর্মযোগ বড় কঠিন। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

*

শ্রীউমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পুরুষ–প্রকৃতি–প্রেম–পরমাত্মা

ধীরা ভট্টাচার্য

পুরুষ, প্রকৃতি, প্রেম, পরমাত্মা শব্দকটি পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধ যুক্ত। পুরুষের মধ্যে সৃষ্টির বীজ, প্রকৃতি তা ধারণ করে। শক্তির আধার প্রকৃতি পুরুষের সৃষ্টি সমগ্র বিশ্বকে আপন পালনী শক্তি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। সৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ প্রকৃতির চলমান শক্তি, আর প্রকৃতির অন্তঃশক্তি বা চেতনাশক্তি তার আনন্দরূপা প্রেমশক্তি।

একটি দেহ কেবলমাত্র তার দেহ-সংঘাতে গড়ে উঠতে পারে না। জীবন পরিপূর্ণ হয় তার শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আনন্দময় চেতনায় চৈতন্যময় হয়ে। শাস্ত্রের পুরুষ প্রকৃতি আর স্থূল জগতের পুরুষ নারী উভয় ক্ষেত্রেই এই সত্য প্রযোজ্য। শাস্ত্রের পুরুষ ও প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে স্থূল জগতের নারী পুরুষের আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমার এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ অধ্যাত্মমুখী, দেহগত কোন কামনার প্রসঙ্গ এখানে তোলা হচ্ছে না। মানুষের মনে প্রতিনিয়ত শত সহস্র ভাবের উত্থান পতন চলছে। বিভিন্ন ভাবের দোলায় চঞ্চল মন দোদুল্যমান। কেউ বলতে পারে না কখন হঠাৎ কোন এক-জন মানুষের মনের ভাব আর একজন মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা হয়ে যাবে। এই ভাবের বন্ধন যে কেবল নারী পুরুষে হবে তার কোন মানে নেই। এই ভাবের একত্ব পুরুষে পুরুষে হতে পারে, নারীতে নারীতেও হতে পারে।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই তা হয়নি। স্বামীজীর চিন্তা ভাবনা যতই ঠাকুরের ভাবাদর্শের সঙ্গে মিলিত হচ্ছিল ততই উভয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ বেড়ে চলেছিল। স্বামীজীর

বিপরীত মুখী ভাব যখন ঠাকুরের ভাবের অনুকূল হল তখনই নরেন ও ঠাকুরের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধন স্থাপিত হল যার ফলশ্রুতি নরেনের বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হওয়া। যেখানে স্বর্গীয় প্রেম, অপার আনন্দ সেখানেই পরমাত্মার স্থিতি। শ্রীচৈতন্য ভাবে নিত্যানন্দ ভাবিত, দুই অনুকূল ভাব স্রোত এক পথে প্রবাহিত হল। প্রেমের বন্যায় আপামর জনতা প্লাবিত হল। পরমাত্মা এসে মিলিত হলেন জীবাত্মায়।

শ্রীমা ও ঋষি অরবিন্দ। একজন সুদূর ফরাসীদেশ বাসিনী, আবাল্য আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিনী, স্বামী-পুত্র নিয়ে গৃহিনী। অন্যজন উচ্চশিক্ষিত পরাধীন দেশের নাগরিক, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা। বিধির বিধানে এঁরা পরিচিত হলেন ভারতের পণ্ডিচেরী শহরে। গীতা, উপনিষদের ভাবনায় ভাবিত ঋষি অরবিন্দের আধ্যাত্মিক ভাবনার দ্বারা ফরাসী মহিলা পল ঈশার অধ্যাত্ম চেতনায় চৈতন্যময়ী হলেন। অরবিন্দের সঙ্গে একদিনের সাক্ষাতেই পল ঈশার শ্রীমা হয়ে যাননি। ঋষি অরবিন্দের সান্নিধ্য তাঁকে গভীরভাবে প্রেরণা দিয়েছিল মুক্তির পথ খুঁজতে, অবশ্যই তিনি আগে শ্রীঅরবিন্দের ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তবেই না তিনি নিজ দেশ, স্বামী, পুত্র ছেড়ে ভারতে বসবাসী হতে পেরেছিলেন ও ঋষি অরবিন্দের দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত হওয়ার যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে পরমাত্মার দিব্য অনুভূতি লাভ করেছিলেন।

মহামানব, মহীয়সী নারীদের প্রসঙ্গ বাদ দিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন আকর্ষণ বিরল। কেবল নারীর প্রতি কোন নারী ভাবের মিলনে মিলিত হয়েছেন এমন ঘটনা আমার জানা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধুত্বের সংঘাত লাগে স্বার্থের দ্বন্দ্বে, সেখানে প্রেম ভালবাসা দূরের কথা বন্ধুত্ব রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্কুল জীবনে একটি চোদ্দ বছর বয়সের মেয়ের প্রতি একটি ষোল বছর বয়সের

মেয়ের অদ্ভুত আকর্ষণ দেখেছি। তাদের স্কুল ছিল মর্নিং সেক্সনে, মোট সময় ছিল চার ঘণ্টা, দুজনে এক ক্লাসেও পড়ত না, টিফিন সময়ে মিনিট দশেকের জন্য তাদের দেখা হত। কিন্তু এত গভীর ভালবাসা যে, একদিনের অদর্শনে সুন্দর চিঠির আদান-প্রদান, গরমের ছুটিতে, পুজোর ছুটিতেও ঐ চিঠি দেওয়া নেওয়া। আমি এ আকর্ষণের কোন ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাইনি। অপার্থিব ভালবাসা ছাড়া আমি একে আর কিছু ভাবতে পারি না। দুটি অপরিণত মনের এ আকর্ষণ যেখানে দেওয়া-নেওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না, একি জন্মান্তরের কোন সম্পর্ককে মনে করিয়ে দিয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

*

লক্ষ্মী বস্ত্রালয়

১০০/এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
(বসুশ্রী সিনেমার পাশে)
অর্ধ শতাব্দীর উপর সুপরিচিত প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা

কলকাতার ছর-রা কুমারেশ ঘোষ

অন্নদাতা

কলকাতা। কলকাতা।
তুমি একটা যা-তা!
আমাদের বুকে ঘোরাও জাঁতা।
তোমার রাস্তার পদে-পদে
মরণ-ফাঁদ পাতা!
অথচ তুমিই অন্নদাতা।

পচা নর্দমা / পাকা ড্রেন

আগে কলকাতায় ছিল পচা-নর্দমা,
তাই বাঙ্গালীর ছিল রমরমা।
এখন কলকাতায় হয়েছে পাকা ড্রেন
তাই বাঙ্গালীও ধরেছে লোকাল ট্রেন।

আঙুর ফল টক

'কলকাতায় বাস করা যায় না'
যেন আঙুর ফল টক!
লাফাতে জানিসনে ওরে 'শেয়াল'
কেবল মুখেই বকবক।

বিশ্বাস নাই মনে হরিভক্ত

বিজ্ঞান বলে ভগবান নাই,
বিজ্ঞানী মালা জপে মরে,
ঈশ্বর নাই ডাক্তার বলে,
হাতে মাদুলি তাবিজ পরে।
নাস্তিক বলে ভগবান নাই,
তবু ঠাকুরে করে প্রণাম,
যারা মুখে বলে বুজরুকি সব,
তারা মাতোয়ারা হরিনাম।
ভগবান নাহি বলিছে যাহারা,
যদি ছেলেমেয়ে রোগে পড়ে,
দুকান মলিয়া মাথা কোটে তারা
ওই নিরালা ঠাকুর ঘরে।
মাথা উঁচু করে পাপ করে যারা,
মুখে বলে ভগবান নাই,
সেই কঠিন বিপদে পড়ে যবে সে যে
বলে কোথায় বল পালাই ?
মানুষ খুনেতে পাপ কিছু নাই,
আমি পাপের ভাগী যে নই,
রত্নাকরের সেই মুখ দিয়া,
তবে রাম নাম পশে কই ?
স্বার্থের লাগি ঈশ্বর আছে,
কভু ডাকিনাকো প্রাণধনে,
তাই ভোগান্তি কাটেনা কখনো
মোদের বিশ্বাস নাই মনে ॥

নন্দিনীর ভালবাসা ইরা চক্রবর্তী

তোমারে করিব জয় এই আশা নিয়ে,
গড়েছিনু সযতনে সীমাহীন প্রেম দিয়ে
কল্পনার সৌধখানি আপনার মনে,
বিধাতার দান ছিল সর্বতনু ঘিরে
আরো কত করিনু সঞ্চয় তারপরে—
সব তোমা তরে ; কি হয়—কে জানে।
যবে পিতা নতমুখ, মাতা কেঁদে কন
"দিবসে নামিবে নিশা, শূন্য পুরী মাঝে
এই খেলা তোমার কি সাজে ?"
মনে দোলা ছিল, তবু ফিরিনিকো
তোমা তরে নিয়েছিনু দুই হাত ভরি,
অনুরাগ সিক্ত শুধু কমলের কলি ॥
চলেছিনু মৃদু হাসি আনন্দ সাগরে ভাসি
ছায়াসম সঙ্গিনী মোর ছিল পিছে
সেইক্ষণে জানিনি তো বিধাতা হাসিছে।
এলে তুমি মৃদু হেসে বেনু হাতে মোর পাশে
ক্ষণিক থামিলে, তারপরে তুলে নিলে,
সঙ্গিনীর হাত হতে শুধু দুটি শুভ্র কুন্দ কলি।
বজ্রাঘাতে দীর্ণ হয়ে, আহত নয়ন মেলে
চাহিয়া রহিল মোর রক্ত পদ্মগুলি।
সেইক্ষণে রাজরক্ত উঠিল জ্বলিয়া
ছিন্ন করি ফুলমালা ক্রোধে অন্ধ রাজবালা
তুলে নিল দ্রুত করে লৌহ শলাকা।
উন্মত্ত হুতাশনে দাঁড়াল ঘিরিয়া
মুহূর্তের তরে অভিমান রাশি আসি
করতলে ছিল পদ্ম তাহাতে মিশিল রক্ত
নন্দিনী করিল পূজা তার দেবতারে ॥

যেন মনে হয় তাপস হালদার

যেন মনে হয় কোন এক সঙ্গীত বেজে উঠে প্রাণে,
কি তার ভাষা কিংবা কি তার ভাব কে জানে !

হয়তো সে কোন চিরন্তনের বাণী
কিংবা জীবনের চূড়ান্ত সত্য,

বেজে উঠে সকলের হৃদয়ে
সত্য আজও ধরা দেয় আপন নিয়মের বাঁধনে।

আপন ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়ে তাইতো হারাবার নেশা।
সকলের মাঝে,
চারিদিকে এত আয়োজন তারি আহ্বানে,
যেন মনে হয় কোন এক সঙ্গীত বেজে উঠে প্রাণে।

জোনাকী তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতির শিশিরে আজো
অতীতের হাসি-কান্না বাজে
কাজে ও অকাজে,
হৃদয়ের তৃণগুলি লজ্জাবতী লতা যেন
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছেয়ে যায় ভাঙা এ ভুবনে।

ঐ শোন ভাবি আসে
হয়তো সে ভালোবাসা

হয়তো ছায়া হয়ে ঊষাতেই আসে
কিংবা বাণী হয়ে মনের আকাশে
আলো হয়ে আসে
তুলো-পেঁজা মনের দুয়ারে
হারানো সে ভাষা গান হয়ে যায় ॥

তোমরা ভূদেব কর

তোমরা বড় ভালো আছো বড় মমতায় আছো
কমলা লেবুর মতন নরম আলতো ঠোঁট দুটি
ঈষৎ বাঁকিয়ে বক্ বক্ করতে করতে
যখন এগোও বন্ধুদের সঙ্গে
ভারী ভালো লাগে।

ভারী আরাম হয় আমার। চোখের আরাম
মনের আরাম। মনে হয় পৃথিবীটা এখনো
কিছু সুন্দর; তোমার বিরাট দুটি চোখের মতন
রহস্যময়,
হয়তো তোমার জন্যই অল্প
শিউলি ফুলের সুগন্ধ ছড়ানো
খাম
কখনো কখনো কারো কারো নামে এসে যায়···

তুমি কি পাঠাও চিঠি কারো নামে
অস্ফুট আঙুলে লিখে গোপনে গোপনে
গোলাপ কুঁড়ির মত দুটি স্তনে বুকের ভেতরে
নিয়ে যাও কারো নাম বয়ে ?

অল্প সাবধানে থেকো হে, কিশোরী
অল্প লুকিয়ে রাখো তোমার সুবাস
গলির মুখে দাঁড়ানো একেবারে আমার মতন
লোকটাও
হতে পারে খুনী ও ধর্ষণকারী···

আমি মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

সবাই যখন আমার কথা
করছে বলাবলি,
আমি তখন আমার সাথে
করছি গলাগলি !

আমি তখন ধরছি পাখি
পুষছি মনের খাঁচায়
আমার আমি নিত্যদিনই
আমায় কেবল নাচায় ।

কভু আমি পড়ছি বসে
কক্ষনো বা লিখি,
কক্ষনো বা ইতিহাসের
সত্যটুকু শিখি ।

কারোর সাথেই মন মেশে না
একলা একাই থাকি,
আমার মনের দুঃখগুলো
মনেই জমা রাখি ।

অমনোনীতা শ্রীসুপ্রিয় বাগচী

পরিচিত গলা শোনা যায়—
কে যেন দরজায়—খুলবার প্রতীক্ষায় ।

খুলতেই এক দমক হাওয়া ছড়িয়ে যায় ঘরময়
স্মৃতির অদ্ভুত ঘ্রাণে পার হয়ে কয়েকটা বছর
লণ্ডভণ্ড করে দেয় সামগ্রিক চেতনার যোগফল
কপালে সিঁদুর টিপ, টেপা গাল, ফোলানো
নাকের পাটা—নিশ্বাস ছড়িয়ে যায়
জ্বলতে থাকে, পুড়তে থাকে—দাবানল
গ্রাস কোরতে কোরতে এগিয়ে আসে
বেরোবার পথ নেই সমগ্র দরজা জুড়ে
দাঁড়িয়ে থাকে তাবৎ প্রতিভার অসার পরিচিতি

দ
র
জা
র
ফ্রে
মে
ফ্রিজ শটে—জবাবী কার্ডে অমনোনীতা কবিতার
পা
ণ্ডু
লি
পি !

জবা—রক্তমুখী লতিকা দাশগুপ্ত

এক সন্ধ্যায় বলেছিলে
'আমার প্রিয় কবিতা
অমর্ত্যের ছন্দে লয়ে গড়া'
সে তো নয় বহুদিন।
হাতে ধরা মাধুরীর পাত্রখানি ভেঙে চুরমার
ভিন্ন অনুরাগে।
অসুন্দর নির্দয়তা সর্ব অঙ্গে চন্দন তিলক।
ফুলগুলি হয়েছে পাথর।
প্রতিটি পীড়ন আজ প্রতিপক্ষ গড়ে
নির্জন শরণে ফুটে ওঠে একে একে
জবা, জবা—রক্তমুখী।
অন্তর্যামী জানে একদিন শক্তিপূজা হবে।

জানি দেবকুমার গুহ

নটরাজের পদতলে মেঘের ছায়া দেখি
বৃষ্টি তাহার সূর্যখানি প্রলয় পিনাক বাজে
মেঘের নাচন ভৈরবেরি প্রাণের পরে রাখি
নীলের হাসি মেঘের পরে তার শিরেতেই সাজে।
আজ যত সব পড়ছে ছায়া অনাহূতের কালে
কাল সে তাহা কায়া ধরে মহাদেবের ভালে
ভগবানের সাতটা বছর সত্তরেতে বাঁধা
এমনি করেই তাহার গানে প্রাণটি আমার সাধা।
বাজাও বাজাও আরও বাজাও প্রলয় পিনাকখানি
বাজবে তখন হৃদয়মূলে তোমার দেউল সাজাও
আমি সেই দেশেরেই জানি আমি সেই দেশেরই জানি।